সংখ্যালঘু আইন

কে কী বলেন

'সংখ্যালঘু' শব্দটি গত ৩০ বছরে দেশে যতটুকু না আলোচিত হয়েছে, তারচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে গত দুই সপ্তাহে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর সংসদে প্রতিনিধি বাড়ানোর ঘোষণা দেবার পরই 'সংখ্যালঘু' শব্দটি পৃথক শব্দে পরিণত হয়েছে। যদিও সরকারি আইন মন্ত্রণালয় এখনও এই আইন করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু জানাচ্ছে না.. লিখেছেন **জাকির হোসেন**

'আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, বাংলাদেশের সব ধর্মের সব বর্ণের, সব নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রতিটি মানুষই বাংলাদেশের নাগরিক। সব ধর্মের প্রতি আমার সমান শ্রদ্ধা রয়েছে। এদেশের মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ সব ধর্মের সব আদিবাসী প্রতি মানুষই বাংলাদেশী। এই চমৎকার ধর্মীয় মন্ত্রিতির দেশে যারা 'সংখ্যালঘু' শব্দটি ব্যবহার করে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে আমাদের মাঝে বিভক্তির দেয়াল তুলতে চায়, তাদের বিষয়ে আমি দেশবাসীকে সতর্ক করে দিচ্ছি...।'

১৯ অক্টোবর রাত ৮টা ৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রীর রেডিও-টিভির ভাষণে এটা ছিল একটা অংশ। রাজনৈতিক মহলে সংখ্যালঘু আসন সৃষ্টি হবে বলে জল্পনা-কল্পনা চলছে। চারদলীয় জোট ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম সংসদ বসবে ২৮ অক্টোবর। অষ্টম জাতীয় সংসদের এই অধিবেশন নিয়ে আইন মন্ত্রণালয় কোনো সুস্পষ্ট মন্তব্য করছে না। তবে রাজনৈতিক মহলে প্রথম অধিবেশনে সংখ্যালঘুদের সংরক্ষিত আসন, সাপ্তাহিক ছুটির দিন পরিবর্তন এবং গত সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংক্রান্ত আইনের সংশোধনের বিষয়টি রয়েছে। বর্তমান সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে নির্যাতনের সংবাদগুলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত বলা হয়েছে। তবে কিছু কিছু নির্যাতনের সত্যতা সরকারি দপ্তর স্বীকার করে নিচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করছেন। তবে এ মুহূর্তে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো সংখ্যালঘু সংরক্ষিত আসন।

এই আইন সংক্রান্ত সরকারি বক্তব্য হচ্ছে, সংখ্যালঘুদের সংসদে প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি করা। সংসদে প্রতিনিধির সৃষ্টি হলে দেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় তারা অবদান রাখতে পারবেন বলে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলছেন, 'সংখ্যালঘু' শব্দটি ব্যবহার করে একটি শ্রেণী বিভাজনের চেষ্টা করছে। কিন্তু সংখ্যালঘু যাদের বলা হচ্ছে তারা এ ধরনের আইনের বিরোধিতা করছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নিমচন্দ্র ভৌমিক জানান, চারদলীয় সরকার এ ধরনের কোনো আইনের করতে চাইলে আমরা এর বিরোধিতা করবো। পাকিস্তান আমলে এ ধরনের আইন প্রচলন ছিল। কিন্তু এখন তো আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমরা সবাই বাঙালি। এ ধরনের আইন করে জাতিকে পৃথক দেবে।

পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের উপদেষ্টা ললিত মোহন নাথ বলেন, এই আইন করা হলে বাংলাদেশকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হবে। ধর্মের পরিচয় আমাদের তৃতীয় পরিচয়। প্রথম পরিচয় আমরা মানুষ, দ্বিতীয় পরিচয় আমরা বাংলাদেশী। সুতরাং এভাবে আমাদের আলাদা করা ঠিক হবে না। তিনি বলেন, পৃথিবীর যেসব দেশে গণতন্ত্র রয়েছে, সেসব দেশে কোথাও সংখ্যালঘুদের পৃথক করা হয়নি। অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের ধর্মের ভিত্তিতে তারা আলাদা করেনি। পাকিস্তানে এ ধরনের আইন প্রচলন

আছে। তবে পাকিস্তানকে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে স্বীকার করি না। সেখানে বেশির ভাগ সময়ই সামরিক শাসনে আবর্ত ছিল। তাছাড়া ব্রিটিশ আমলে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্তি করায় ভারতবর্ষ আজ তিন ভাগে বিভক্ত। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধে আমরা সবাই যুদ্ধ করেছি। তখন তো হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কেউ পৃথক ছিল না। সবাই তো সম্মিলিতভাবেই আমরা এ দেশ স্বাধীন করেছি। এখন স্বাধীন দেশে কোটার মধ্যেমে পৃথক করার কোনো মানে হয় না। এ ধরনের আইন হলে আমরা অবশ্যই এর বিরোধিতা করব।

পৃথিবীর যেসব দেশে গণতন্ত্র রয়েছে, সেসব দেশে কোথাও সংখ্যালঘুদের পৃথক করা হয়নি। অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের ধর্মের ভিত্তিতে তারা আলাদা করেনি। পাকিস্তানে এ ধরনের আইন প্রচলন আছে। তবে পাকিস্তানকে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে স্বীকার করি না। সেখানে বেশির ভাগ সময়ই সামরিক শাসনে আবর্ত ছিল। তাছাড়া ব্রিটিশ আমলে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্তি করায় ভারতবর্ষ আজ তিন ভাগে বিভক্ত। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধে আমরা সবাই যুদ্ধ করেছি। তখন তো হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কেউ পৃথক ছিল না। সবাই তো সম্মিলিতভাবেই আমরা এ দেশ স্বাধীন করেছি।

সংরক্ষিত মহিলা আসন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলেন, ঐতিহাসিকভাবেই আমাদের সমাজ ব্যবস্থা মহিলাদের মর্যাদা দেয়নি। তাই তাদের বলার অধিকার দিতে হবে। এতদিন আমরা সংসদের ৩০ জন মহিলা সদস্য নির্বাচন করেছি। আমি মনে করি এটা ৩০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিটি জেলা থেকে একজন করে প্রতিনিধি নেয়া উচিত। তাদেরকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হবে। সেখানে পুরুষ ও মহিলা সবার ভোট দেবার সুযোগ থাকবে। তবেই তাদের প্রতিনিধিত্ব ঠিক থাকবে।

সংরক্ষিত বা সংখ্যালঘু জাতির মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের বক্তব্য– সবার বাংলাদেশ, সবাই এক। শ্রেণী বৈষম্য থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে সংবিধান করে আইন জারির মাধ্যমে কাউকে পৃথক করা অনৈতিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষক অধ্যাপক চৌধুরী শামসুল হুদা হারুন বলেন, এটা আপেক্ষিক দৃষ্টিতে গণতন্ত্র নয়। দেশের জনগণ সবাই চায় প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকতে। সুবিধা পাই কি না পাই, সবাই প্রথম শ্রেণীর সুবিধা চাই। আমাদের দেশের সংখ্যালঘুরা স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে সব ধরনের প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। তাদের আলাদা করার বিষয়টা ঠিক হবে না।

'সংখ্যালঘু' শব্দটি গত ৩০ বছরে দেশে যতটুকু না আলোচিত হয়েছে, তারচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে গত দুই সপ্তাহে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর সংসদে প্রতিনিধি বাড়ানোর ঘোষণা দেবার পরই 'সংখ্যালঘু' শব্দটি পৃথক শব্দে পরিণত হয়েছে। যদিও সরকারি আইন মন্ত্রণালয় এখনও এই আইন করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু জানাচ্ছে না। তবে এ ধরনের আইন সংসদের সদস্য সংখ্যাই বাড়াবে কিন্তু কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখবে না। কারণ বিগত সংসদগুলোতে সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৩০ জন এমপি সংসদে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। তারা ছিলো সরকারি মনোনয়নপ্রাপ্ত সদস্য। কোনো বিল পাসের সময় গলায় জোরে হ্যাঁ বলা ছাড়া কোনো ভূমিকা প্রকৃত পক্ষে তাদের ছিল না। সংখ্যালঘুদের সংরক্ষিত আসন আইন করে নতুনভাবে তৈরি হলেও তা কার্যতপক্ষে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তবে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন, এখন যারা সংসদে কিছু বলতে চাইছে অথচ বলতে পারছেন না তাদের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বের দাবি তুলে ধরতে পারবে সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে। এ প্রসঙ্গে নির্মল সেন বলেন, এ ধরনের আইন হলে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সৃষ্টি হবে। সেই ১৯৩৫ সালের আইনের মতো। আমরা দেখেছি ব্রিটিশ আমলে যে আইনটি ছিল তাতে হিন্দুরা হিন্দুদের ভোট দেবে মুসলমানরা মুসলমানদের ভোট দেবে। এমন হলে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সৃষ্টি হবে।

সরকার যাদের জন্য এই আইনটি করতে চাচ্ছে তারাই আইনটির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তারা বলেছেন এ ধরনের আইন হলে প্রতিরোধের চেষ্টা করা হবে। বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের সদস্য এবং সেন থমাস চার্চের জেনারেল সেক্রেটারি জেমস হাজরা জানান, আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি যাতে এ ধরনের কোনো আইন করা না হয়। এ ধরনের আইন হলে আমরা মৌন মিছিল করবো। তিনি বলেন, আমরা এদেশের নাগরিক। সাধারণভাবেই ভোট দিয়ে থাকি। সবকিছুই আমরা সাধারণভাবে করে যাচ্ছি। আমরা দেশেরই জনগণ। জনগণের কাছ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হবো কেন? বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডা. নবেল ডি রোজারিও বলেন, যদি আমাদের আলাদা করে দেয়াই হয় আমরা তা পছন্দ করছি না। কারণ বাংলাদেশ তৈরির পেছনে সব ধর্মের অবদান ছিল। সে হিসেবে বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে সব ধর্মের সমান অধিকার। '৭২-এর সংবিধানও আমাদের সে অধিকার দিয়ে দিয়েছে। সেখানে তো আলাদা করা হয়নি। তবে এখন কেন সরকার আলাদা করতে চাইছে। এটা তো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারেরও পরিপন্থী। আমাদের দাবি আমরা মূলভাবে থাকবো। পৃথক হবো না।

সংরক্ষিত আসনের জন্য বর্তমান সরকারকে সংসদে আইন পাস করাতে হবে। বিগত সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিত থাকার জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসনে বিলের নবায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ফলে অষ্টম জাতীয় সংসদ বসবে মহিলা সাংসদ বিহীন এবং এই আসনে কিভাবে মহিলা সাংসদ সংসদে বসবেন তার ফয়সালাও হবে প্রথম অধিবেশনে। নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করার কথা বলেছে। কিন্তু সব সরকারের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসন সংসদে সরকারের অবস্থান দৃঢ় করে। এতদিন ধরে যে আইন বলবৎ ছিল তা পুনরায় জারি করা হলে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব একই থেকে যাবে। অর্থাৎ তারা সংসদে যাবে-আসবে ঠিকই কিন্তু নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন না। জনবিচ্ছিন্ন এই প্রতিনিধিরা জনগণের কাছেও যান না। যাবার প্রয়োজনও পড়ে না। ফলে দেখা যায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবহেলিত মহিলাদের পক্ষে বলার কেউ থাকে না। তাছাড়া জেলা ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিনিধিরাও পুরুষ থাকেন। মহিলা মেম্বার নিয়োগের বিধান থাকলেও সেটা কার্যকরী না। সে মহিলারাও জনবিচ্ছিন্ন। চেয়ারম্যানের ম্যান্ডেটে প্রার্থী হয়েই খালাস। দেশের প্রায় অর্ধেক নারী। এই নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব জাতীয় সংসদের ৩০০ জনের মধ্যে ৫/৭ জন করছে। যাদের পক্ষে ৬৪টি জেলার নারীর পক্ষ হয়ে কাজ করা খুবই কঠিন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও তাই মনে করেন। দেশের নারীদের প্রতিনিধিত্ব আসা উচিত এবং সেটা সরকারি দলকে ভারী করার জন্য নয়, জনগণের রায় নিয়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবেই আসা উচিত।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুযায়ী সংরক্ষিত সংখ্যালঘুদের আসন সংক্রান্ত আইনের মাধ্যমে সরকার পক্ষকে আরো ভারী করার চেষ্টাই করা হবে। যাদের পক্ষে নিজেদের ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। কারণ ভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধির মাথায় সব সময় কাজ করবে আমি সংখ্যালঘু এবং আমি সংখ্যালঘুদের জন্য, আমার পাশের বাড়ির ভিন্ন ধর্মের লোকটির প্রতিনিধি না।